



## অধ্যায় ১১

# ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক, স্থানিক সময় এবং অঞ্চলসমূহ

ভৌগোলিকভাবে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, কর্কট ক্রান্তি এবং ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমার ছেদবিন্দু, বাংলাদেশের ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় নির্মিত হতে যাচ্ছে একটি সুরম্য মানমন্দির; ছবিতে সেই মানমন্দিরের নকশা

# অধ্যায় ১১

## ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক, স্থানিক সময় এবং অঞ্চলসমূহ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ✓ ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক :
- ✓ অক্ষাংশ
- ✓ দ্রাঘিমাংশ
- ✓ মূল মধ্যরেখা
- ✓ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা
- ✓ বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক অঞ্চল
- ✓ বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশগত ইস্যু ও মানুষের ভূমিকা

তোমরা কি কখনো লক্ষ করেছ কোনো স্থান সম্পর্কে মানুষ কীভাবে একে অন্যকে জানায়? উদাহরণ দেয়ার জন্য বলা যায় কারো বাড়ি খুঁজে পেতে হলে শুধু এলাকার নাম বললে অনেক সময় বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন কোনো একটা বড়ো গাছ, দোকান, ভবন এরকম বিশেষ কিছুর অবস্থানের সাপেক্ষে বাড়ির অবস্থান বলতে হয়, যেটাকে আপেক্ষিক অবস্থান (Relative Location) বলা হয়। এই পদ্ধতি কোনো একটি ছোট স্থানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু পুরো পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর কোনো কিছুর অবস্থান এভাবে জানানো বেশ কঠিন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। সেক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক বা প্রকৃত অবস্থান (Absolute Location)।

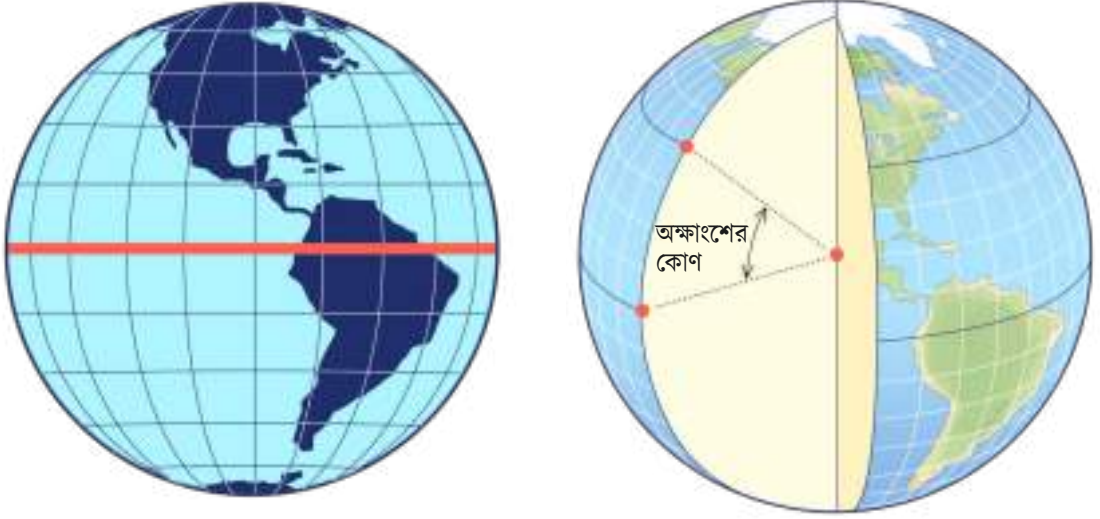
### 11.1 ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক (Geographic Grid)

পৃথিবীর কোনো স্থানের ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক বোঝার জন্য দুই ধরনের কাল্পনিক রেখা ব্যবহার করা হয়; সেগুলো হচ্ছে :

- (1) অক্ষ রেখা।
- (2) দ্রাঘিমা রেখা।

রেখাগুলো বোঝার আগে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কাগজে আমরা যেভাবে একটা বৃত্ত আঁকে পৃথিবী বোঝানোর চেষ্টা করি বাস্তবে সেটা এরকম না, পৃথিবী বলের মত একটা ত্রিমাত্রিক গোলক। কাজেই আমরা যদি একটা বল কিংবা গোলাকার কিছু নিয়ে এর উপরে আড়াআড়িভাবে ডান থেকে বামে সমান্তরাল

১৩১



(ক) অক্ষাংশ পরিমাপ করা হয় বিষুব রেখার সাপেক্ষে। বিষুব রেখা হচ্ছে একটি কাল্পনিক রেখা যা পৃথিবীর মাঝামাঝি বরাবর পূর্ব পশ্চিমে ঘিরে রয়েছে। (খ) অক্ষাংশের কোণ পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে একই দ্রাঘিমা রেখার উপর বিষুব রেখার ছেদবিন্দু এবং সেই অক্ষাংশের জন্য নির্ধারিত অক্ষ রেখার ছেদবিন্দু পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর যোগ করলে যে কোণ পাওয়া যায় সেটিই হচ্ছে অক্ষাংশের কোণ।

## 11.2 অক্ষাংশ (Latitude)

পৃথিবীর কোনো স্থান বিষুব রেখা থেকে কতটা উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত তা অক্ষাংশ দ্বারা বোঝা যায়—এই তথ্যটি বোঝার জন্য বিষুব রেখা কী তা ভালো করে জানা প্রয়োজন। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু থেকে সমান দূরত্বে যে রেখা পৃথিবীকে ঠিক মাঝ বরাবর ঘিরে রয়েছে বলে কল্পনা করা হয় তাকে বিষুব রেখা বা সমাক্ষরেখা বলা হয়। বিষুব রেখা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। অক্ষাংশ নির্ধারণের জন্য বিষুব রেখাকে প্রসঙ্গ রেখা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিষুব রেখা থেকেই যেহেতু অক্ষাংশের কোণ মাপা হয় তাই তার নিজের অক্ষাংশ হচ্ছে শূন্য ডিগ্রী ( $0^\circ$ )। অক্ষাংশ উত্তর ও দক্ষিণে সর্বোচ্চ  $90^\circ$  পর্যন্ত হতে পারে। (লেখা হয় যথাক্রমে  $90^\circ$  উত্তর বা উত্তর মেরু এবং  $90^\circ$  দক্ষিণ বা দক্ষিণ মেরু) তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে প্রতিটি অক্ষাংশের অক্ষ রেখাগুলো একে অপরের সঙ্গে সমান্তরাল, সেগুলো পূর্ণবৃত্ত এবং এই বৃত্তগুলো যতই বিষুব রেখা থেকে মেরুর দিকে আসে তারা ছোট হতে হতে একেকটা বিন্দুতে পরিণত হয়। ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু মূলত দুটি বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়।

অক্ষাংশ কোণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রশ্ন করতে পারে কোন দুটি রেখা এই কোণ উৎপন্ন করে এবং সেই কোণটি কোথায় উৎপন্ন হয়। আমরা যে স্থানের অক্ষাংশ বের করতে চাই সেই স্থান থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর একটি রেখা (ছবি) কল্পনা করে নাও এবং কেন্দ্র থেকে বিষুব রেখা বরাবর আরেকটি রেখা কল্পনা করে নাও। দুটি রেখাই উত্তর দক্ষিণে একই তলে থাকতে



হবে। (আমরা একটু পরেই দেখব, উত্তর দক্ষিণে একই তলে থাকার অর্থ একই দ্রাঘিমা রেখায় থাকা) এই দুটি রেখা যে কোণ তৈরি করে সেটাই হচ্ছে অক্ষাংশ।

অক্ষাংশে  $0^\circ$  থেকে  $90^\circ$  পর্যন্ত অনেকগুলো সমান্তরাল অক্ষ রেখা থাকলেও কতকগুলো অক্ষ রেখা বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। (অক্ষ রেখাগুলো পৃথিবী বা গ্লোবে সমান্তরাল বৃত্ত হলেও মানচিত্রে সেগুলো সমান্তরাল রেখা হিসেবে দেখানো হয়) গুরুত্বপূর্ণ অক্ষ রেখাগুলো হচ্ছে :

### 11.2.1 বিষুব রেখা (Equator)

এটি হচ্ছে  $0^\circ$  অক্ষাংশ। বিষুব রেখা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর এবং এই রেখাটি পৃথিবীকে দুটি গোলার্ধে বিভক্ত করে যেগুলোকে যথাক্রমে উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধ বলে। এখানে লক্ষণীয় যে 21শে মার্চ এবং 23শে সেপ্টেম্বর দুপুর 12.00টায় সূর্যের আলো এই রেখা বরাবর সকল স্থানে লম্বভাবে পড়ে। এই দুই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য সমান হয়।

### 11.2.2 কর্কটক্রান্তি রেখা (Tropic of Cancer)

এটি হচ্ছে বিষুবরেখার সাপেক্ষে  $23.5^\circ$  উত্তর অক্ষাংশ রেখা। বাংলাদেশের উপর দিয়ে এই রেখা অতিক্রম করেছে। প্রতি বছর 21শে জুন দুপুর 12.00 টায় এই রেখার অন্তর্গত সকল স্থানে সূর্যের আলো লম্বভাবে পড়ে। এই তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য বা স্থায়িত্ব সবচেয়ে বেশি হয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হয়।

### 11.2.3 মকরক্রান্তি রেখা (Tropic of Capricorn)

এটি হচ্ছে বিষুব রেখার সাপেক্ষে  $23.5^\circ$  দক্ষিণ অক্ষাংশ রেখা। প্রতি বছর 22শে ডিসেম্বর সূর্যের আলো এই রেখার অন্তর্গত স্থানে দুপুর 12.00টায় লম্বভাবে পড়ে। এই তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য বা স্থায়িত্ব সবচেয়ে বেশি হয় এবং উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হয়।

### 11.2.4 মেরু রেখা (Polar Circle)

উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধে  $66.5^\circ$  দুটি অক্ষাংশকে যথাক্রমে উত্তর মেরুরেখা (Arctic Circle) এবং দক্ষিণ মেরুরেখা (Antarctic Circle) বলে। কর্কটক্রান্তির উত্তরে এবং মকরক্রান্তির দক্ষিণে সূর্যের আলো কখনোই লম্বভাবে পড়ে না। এখানে গ্রীষ্মকালে অতিদীর্ঘ দিন এবং শীতকালে অতিদীর্ঘ রাত হয়। সত্যি কথা বলতে কী, দিন দীর্ঘ হতে হতে প্রতি বছর 21শে জুন উত্তর মেরুরেখা ঘেরা উত্তরের এলাকায় 24 ঘণ্টাই সূর্যের আলো থাকে, অর্থাৎ 24 ঘণ্টা দিন থাকে। একইভাবে 22শে ডিসেম্বর উক্ত স্থানে 24 ঘণ্টা রাত থাকে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ মেরুরেখা এলাকায় ঠিক এর বিপরীত ঘটনা ঘটে।

## 11.3 অক্ষাংশের তাৎপর্য ও ব্যবহার

কোনো স্থানের ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু জানা কিংবা বোঝার জন্য সেই স্থানের অক্ষাংশ জানা জরুরি। আমরা জানি যে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ তার কক্ষপথের সঙ্গে খাড়াভাবে (90°তে) না থেকে 23.5° কোণে হেলানো অবস্থায় থাকে এবং এই অবস্থায় পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অক্ষাংশে সূর্য থেকে আসা তাপ ও আলোকশক্তি (Insolation) ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পাওয়া যায়। সূর্যের এই বিকিরণের তীব্রতা বিভিন্ন স্থানে ও বছরের সময়ে ভিন্ন হয় এবং এ কারণেই আমরা বিভিন্ন ঋতু উপভোগ করি।



বিষুব রেখা বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে সূর্যের আলো প্রায় লম্বভাবে পরে। ফলে তা তুলনামূলকভাবে কম দূরত্ব অতিক্রম করে এবং কম ছড়ানোর ফলে ভূপৃষ্ঠ বেশি উত্তপ্ত হয়। অপরদিকে মেরু এলাকার কাছাকাছি সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে। ফলে তা বায়ুমণ্ডলের মাঝে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে এবং ভূপৃষ্ঠে বেশি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার কারণে সূর্যরশ্মির তীব্রতা বা তেজ কমে যায়। ফলে সেই সকল অঞ্চল শীতল হয়ে থাকে।

যেহেতু কোনো স্থানের অক্ষাংশের

উপর সেখানে সূর্যালোক কতটা আসবে তার পরিমাণ নির্ভর করে সেহেতু সেসব স্থানের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণও এই অক্ষাংশের উপর নির্ভর করে। শুধু তাই নয় বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্র স্রোতের পরিবর্তনও অক্ষাংশ দিয়ে প্রভাবিত হয়। এমনকি কোনো জায়গার ভূমি কেমন হবে বা এর জীবজগতের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তার উপরেও অক্ষাংশের প্রভাব রয়েছে।

### 11.3.1 অক্ষাংশের ভিত্তিতে বিভক্ত বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ

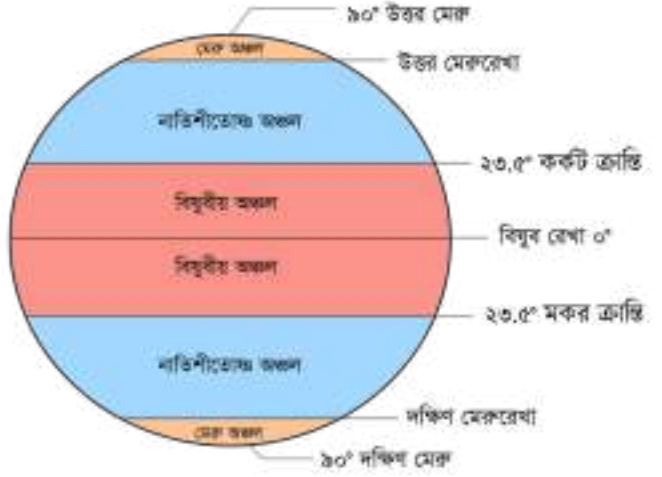
অক্ষাংশের ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এই সকল অঞ্চলে জলবায়ু, গাছপালা, পশুপাখি এমনকি ভূমিরূপও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে যা অন্য অঞ্চল থেকে আলাদা। গুরুত্বপূর্ণ অক্ষ রেখার ভিত্তিতে ভাগ করা অঞ্চলগুলো হচ্ছে বিষুবীয় অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল এবং মেরু অঞ্চল। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণের কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার মাঝখানের অঞ্চলটি হচ্ছে বিষুবীয় অঞ্চল। কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে উত্তর মেরুরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল হচ্ছে উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। একইভাবে মকরক্রান্তি রেখা থেকে দক্ষিণ মেরুরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল হচ্ছে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। দুইটি মেরু রেখার উত্তরে এবং দক্ষিণের অঞ্চলকে বলে মেরু অঞ্চল। আমাদের বাংলাদেশের ঠিক মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি গিয়েছে তাই এই দেশের দক্ষিণাঞ্চল হচ্ছে বিষুবীয় অঞ্চল এবং

উত্তরাঞ্চল হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল।

**প্রশ্ন:** তুমি কি কখনো ককটক্রান্তি অতিক্রম করেছ? ককটক্রান্তির উপরে থাকলে ২১শে জুন দুপুর বারোটায় তোমার কোনো ছায়া পড়বে না, কথটির অর্থ কী?

**প্রশ্ন:** তোমার স্কুলটি কি বিষুবীয় অঞ্চলে, নাকি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে?

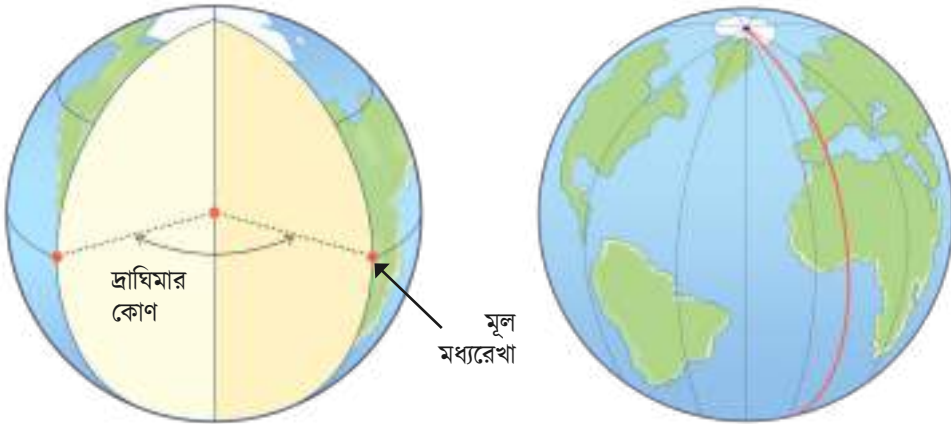
**প্রশ্ন:** তুমি কি জানো যে দৈর্ঘ্যের একক মিটারকে (m) এমনভাবে নির্ধারিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল যেন পৃথিবীপৃষ্ঠে তুমি যদি উত্তরে কিংবা দক্ষিণে ঠিক একশ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম কর তাহলে তোমার অক্ষাংশ ১ ডিগ্রি পরিবর্তন হবে? হিসাব করে দেখাও সেটি সত্যি। (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬ হাজার কিলোমিটার)



অক্ষাংশের ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চল সমূহ।

## 11.৭ দ্রাঘিমাংশ (Longitude)

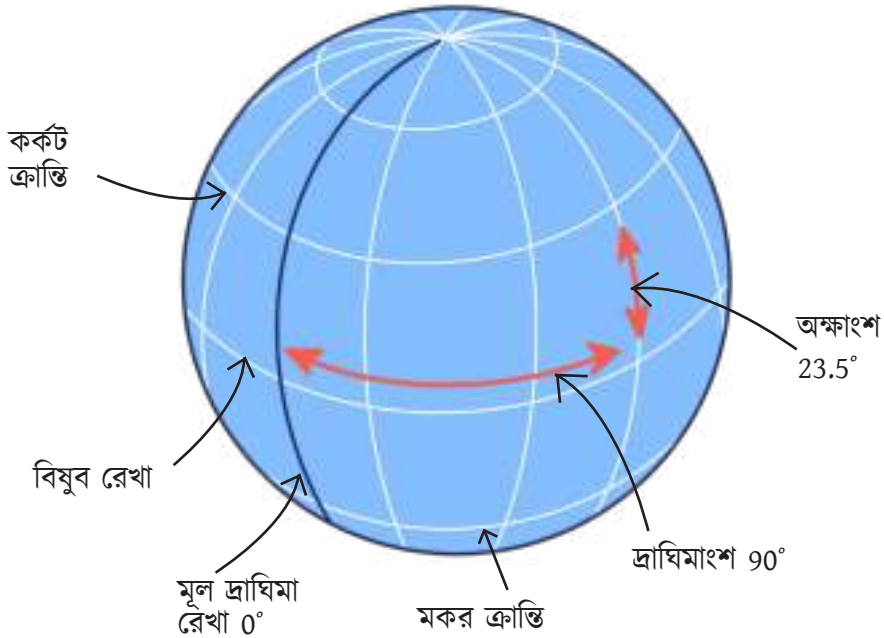
পৃথিবীর কোনো স্থান একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গরেখা থেকে কতটা পূর্ব বা পশ্চিমে তা দ্রাঘিমাংশ দ্বারা দেখানো হয়। যে রেখা দ্রাঘিমাংশ নির্দেশ করে তাকে দ্রাঘিমা রেখা (Meridian) বলে। যে রেখার সাপেক্ষে পূর্ব



(ক) দ্রাঘিমাংশ মূল মধ্যরেখার সাপেক্ষে পরিমাপ করা হয়। মূল মধ্যরেখা একটি কাল্পনিক দ্রাঘিমারেখা যেটি অর্ধবৃত্ত এবং ইংল্যান্ডের গ্রিনিচ শহরের উপর দিয়ে উত্তর দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। (খ) দ্রাঘিমাংশ বা দ্রাঘিমার কোণও পৃথিবীর কেন্দ্রে মাপা হয়। এক্ষেত্রে বিষুবরেখার উপর মূল মধ্যরেখার ছেদবিন্দু এবং সেই দ্রাঘিমা রেখার ছেদবিন্দু পৃথিবীর কেন্দ্রে বরাবর যোগ করলে পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণ পাওয়া যায় সেটিই হচ্ছে দ্রাঘিমাংশ বা দ্রাঘিমার কোণ।

বা পশ্চিমে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা হয় তাকে প্রসঙ্গ রেখা বা মূল মধ্যরেখা (Prime meridian) বলে। এটি ইংল্যান্ডের গ্রিনিচ শহরের উপর দিয়ে গিয়েছে। প্রতিটি দ্রাঘিমা রেখা একটি অর্ধবৃত্ত এবং সেগুলোর দৈর্ঘ্য সমান। দ্রাঘিমা রেখা এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সকল দ্রাঘিমা রেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রতিটি দ্রাঘিমা রেখা বিষুবরেখাকে লম্বভাবে অতিক্রম করে। দ্রাঘিমার মান  $0^\circ$  (মূল মধ্যরেখা) থেকে  $180^\circ$  পর্যন্ত পূর্ব এবং পশ্চিমে বিস্তৃত। তোমরা কি জান মূল  $0^\circ$  মধ্যরেখা এবং পূর্ব  $180^\circ$  দ্রাঘিমা রেখার ঠিক মধ্যবর্তী পূর্ব  $90^\circ$  দ্রাঘিমা রেখাটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে? যেহেতু একটি দ্রাঘিমা রেখায় উত্তর কিংবা দক্ষিণের যে কোনো বিন্দুতেই দ্রাঘিমাংশের মান সমান তাই পৃথিবীর কোনো অবস্থানের দ্রাঘিমার মান বের করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে বিষুব রেখায় সেই মানটি বের করা। বিষুব রেখার উপর মূল মধ্যরেখার ছেদবিন্দু এবং একটি দ্রাঘিমা রেখার ছেদবিন্দু পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণটি তৈরি করে সেটিই হচ্ছে সেই দ্রাঘিমার কোণ। কয়েকটি দ্রাঘিমা রেখা বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—মূল মধ্যরেখা এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা।

### 11.4.1 মূল মধ্যরেখা



কর্কট ক্রান্তি রেখা এবং  $90$  ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখার ছেদ বিন্দু বাংলাদেশে পড়েছে, সে কারণে বলা যায় বাংলাদেশের অবস্থান অক্ষাংশ  $23.5^\circ$  উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ  $90^\circ$  পশ্চিম।

লন্ডনের কাছাকাছি অবস্থিত গ্রিনিচের (Greenwich) রয়াল অবজারভেটরির উপর দিয়ে যে দ্রাঘিমা রেখার অবস্থান তাকে মূল মধ্যরেখা বলে এবং এর মান  $0^\circ$ । এখানে লক্ষণীয় যে মূল মধ্যরেখার কোনো পূর্ব-পশ্চিম নেই, বরং এই রেখা পৃথিবীকে পূর্ব এবং পশ্চিম দুটি গোলার্ধে বিভক্ত করে।



## 11.4.2 আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

আমরা জেনেছি যে প্রতিটি দ্রাঘিমা রেখা এক একটি অর্ধবৃত্ত। সেক্ষেত্রে মূল মধ্যরেখার একেবারে বিপরীত দিকের যে দ্রাঘিমা রেখা আছে তার মান হবে  $180^\circ$ । এক্ষেত্রেও শুধু মান  $180^\circ$  লেখা হয়, এই দ্রাঘিমাংশের কোনো পূর্ব বা পশ্চিম থাকে না। এই দ্রাঘিমা রেখার নাম আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা। পৃথিবীতে দিনতারিখ গণনার জন্য এই রেখাটির উদ্ভব। এই রেখার দুই পাশে দুইটি ভিন্ন তারিখ ধরে নেওয়া হয়। বিষয়টা একটু বিচিত্র মনে হলেও খুবই প্রয়োজনীয়। এই রেখাকে মাঝে রেখে কেউ যদি পূর্ব গোলার্ধের দিকে যায় তবে সে পরের তারিখে চলে যাবে। আবার পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধের দিকে গেলে হবে উল্টোটা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই সময়ে বিভিন্ন রকমভাবে সূর্যের আলো পৌঁছায়। কোথাও দিন, কোথাও রাত। তাই কেউ যখন এক দেশে থেকে বলে তার ওখানে এখন বিকেল ৪টা আসলে সেটা অন্য গোলার্ধের দিকে যারা আছে তাদের জন্য ঠিক কয়টা তা হিসাব করতেই এই রেখাটি গুরুত্বপূর্ণ।

এই দ্রাঘিমার আরও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তোমরা সংযুক্ত পৃথিবীর মানচিত্রে দেখতে পাচ্ছ এই রেখা অর্ধবৃত্ত (গ্লোবের ক্ষেত্রে) বা সরল রেখা (মানচিত্রের ক্ষেত্রে) না হয়ে কিছু কিছু স্থানে আঁকাবাঁকা হয়ে স্থলভাগ এড়িয়ে শুধু প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে গেছে যেন একই দেশের বা এলাকার দুইদিকে দুইরকম তারিখ না হয়ে যায়।

## 11.4.3 ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ে দ্রাঘিমা রেখার ব্যবহার

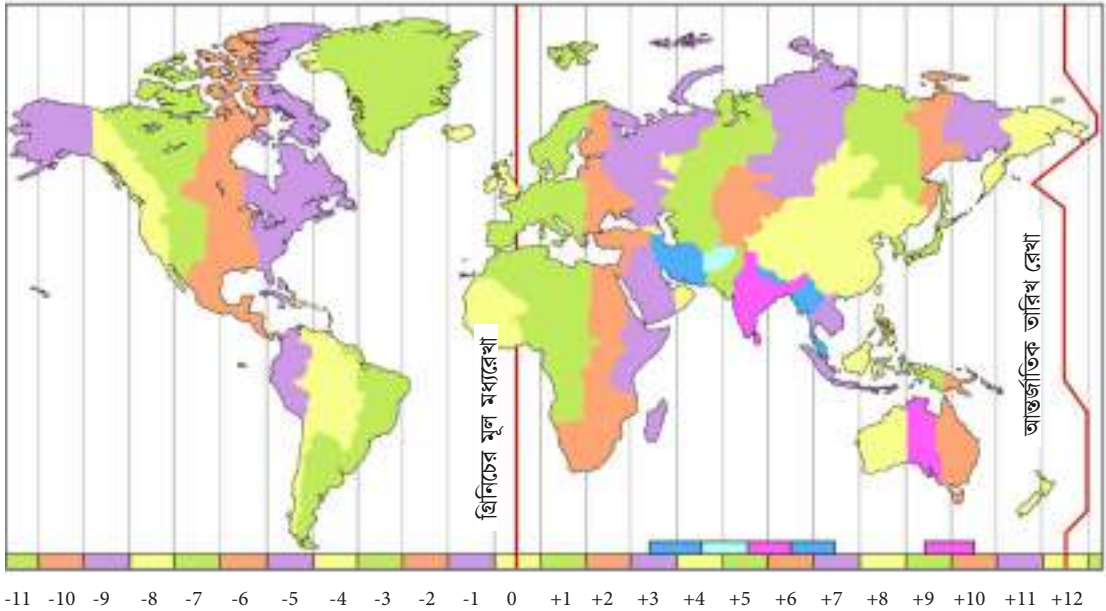
আমরা জানি অক্ষাংশ উত্তর-দক্ষিণ বরাবর কোনো স্থান বা বিন্দু ঠিক কোথায় আছে সেটি জানিয়ে দেয়, কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম বরাবর সেই স্থান বা বিন্দু ঠিক কোথায় আছে কোথায় আছে সেটি দ্রাঘিমাংশ নির্দিষ্ট করে দেয়। যে কোনো স্থানের প্রকৃত অবস্থান জানার জন্য তাই অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ একত্রে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে অক্ষ রেখা এবং দ্রাঘিমা রেখা মিলে পৃথিবী পৃষ্ঠে অথবা গ্লোবের (পৃথিবীর ছোট মডেল) উপর ছক কাগজের ন্যায় একটি কাঠামো তৈরি করে যাকে বলা হয় গ্র্যাটিকুল (Graticule)। এই ছকে কোনো স্থানের অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ জানা থাকলে ঠিক ছক কাগজের ন্যায় আমরা সেই স্থানের অবস্থান বের করতে পারি। এছাড়া কোনো স্থানের সময় এবং তারিখ নির্ধারণের জন্যও দ্রাঘিমাংশের মান গুরুত্বপূর্ণ।

## 11.4.4 সময় ও তারিখ নির্ণয়

মূল মধ্যরেখা ( $0^\circ$  দ্রাঘিমা) যেহেতু গ্রিনিচের উপর দিয়ে গেছে তাই পৃথিবীর যে কোনো স্থানের সময় গ্রিনিচের সময়ের সঙ্গে তুলনা করে নির্ণয় করা যায়। যে কোনো রেখার চারদিক ঘুরে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করে যদি আমরা আবার শুরুর বিন্দুতে ফিরে আসি তাহলে আমরা জানি মোট কোণের পরিমাণ হবে  $180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$ । দ্রাঘিমার ক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিমে  $180^\circ$  করে মোট কোণ হয়  $360^\circ$ । একদিনে

যেহেতু মোট 24 ঘণ্টা তাই প্রতি  $(360 \div 24 = ) 15^\circ$  দ্রাঘিমা অতিক্রম করলে ঘড়ির সময়ের 1 ঘণ্টা করে পরিবর্তন হয়। মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্বদিকে গেলে ঘড়ির সময় বাড়তে থাকে এবং পশ্চিমে গেলে ঘড়ির সময় কমতে থাকে। মূল মধ্যরেখার পূর্বপাশের এলাকার ঘড়ির সময়কে তাই ধনাত্মক (+) চিহ্ন দিয়ে এবং পশ্চিমে ঋণাত্মক (-) চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। দ্রাঘিমা রেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীকে বেশ কয়েকটি সময় জোনে (Time Zone) বিভক্ত করা হয়। বাংলাদেশের দ্রাঘিমাংশ  $90^\circ$  হওয়ার কারণে গ্রিনিচের ঘড়ির সময় থেকে 6 ঘণ্টা এগিয়ে আছে, অর্থাৎ গ্রিনিচে যখন দুপুর 12টা তখন বাংলাদেশে সময় হবে সন্ধ্যা 6টা।

গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার মাঝে পার্থক্য  $180^\circ$ । তাই এই দুই স্থানের মাঝে সময়ের পার্থক্য হবে 12 ঘণ্টা। এখন যদি মূল মধ্যরেখা থেকে একই দিনের একই সময়ে দুইজন মানুষের একজন পূর্বদিকে এবং একজন পশ্চিম দিকে রওয়ানা করে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখায় পৌঁছায় এবং তা অতিক্রম করে, তাহলে পূর্বদিকে যাত্রাকারীর ঘড়ির সময় 12 ঘণ্টা বেশি হবে আর পশ্চিমদিকে যাত্রাকারীর ক্ষেত্রে সময় 12 ঘণ্টা কম হবে। দুজনের সময়ের পার্থক্য 24 ঘণ্টা হয়ে যাওয়ার কারণে



আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ও বিভিন্ন সময় জোন। বাংলাদেশের সময় জোন GMT+6।

তারিখের হিসাব পার্থক্য হয়ে যাবে। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য কেউ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করে পূর্বদিকে এলে তাকে ঘড়িতে 1 দিন পিছিয়ে দিতে হয়। একইভাবে কেউ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করে পশ্চিমে গেলে তার ঘড়িতে 1 দিন এগিয়ে দিতে হবে। যেমন—মনে করো এখন তুমি কোনো দ্রুতগতির যানে করে পূর্বদিকে গিয়ে  $180^\circ$  দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করে গেলে, সেক্ষেত্রে আজ যে তারিখ আছে তোমার ঘড়িতে তা একদিন পিছিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ আজ 21শে ফেব্রুয়ারি

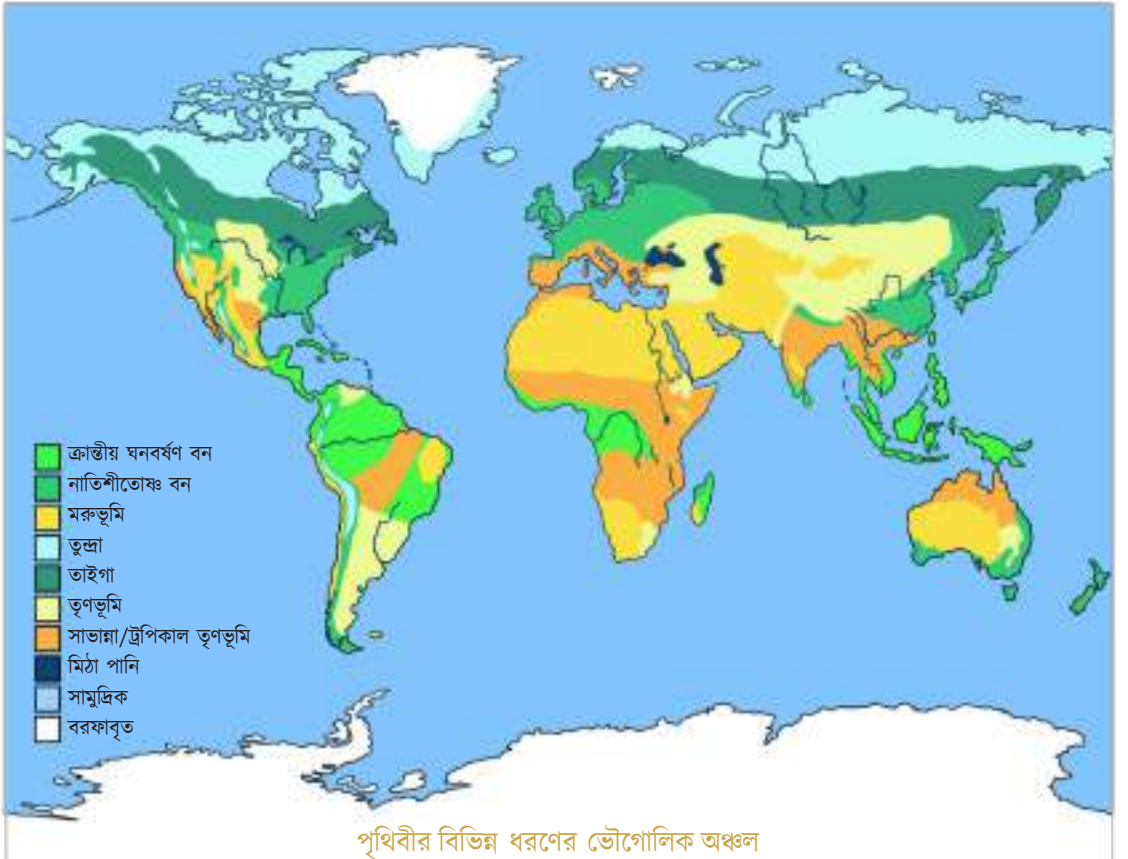
হলে তোমার ঘড়ির তারিখ হয়ে যাবে 20শে ফেব্রুয়ারি। ঠিক একইভাবে তুমি যদি পশ্চিম দিকে গিয়ে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম কর তাহলে আজ 21শে ফেব্রুয়ারি হলে তোমার ঘড়ির তারিখ হয়ে যাবে 22শে ফেব্রুয়ারি।

## 11.5 বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক অঞ্চল

আমরা পূর্বে জেনেছি যে অক্ষাংশের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার জলবায়ু, জীব এমনকি ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হয়। এখন আমরা দেখব এই ভিন্নতা কি রকম হতে পারে।

### 11.5.1 মেরু অঞ্চল

পৃথিবীর ভৌগোলিক দুই মেরুর কাছাকাছি চারপাশের এলাকা মেরু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকার অক্ষাংশ মেরুর কাছাকাছি হওয়ায় সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে, তাই তাপমাত্রা খুব কম। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রচণ্ড শীতল তাপমাত্রা, পুরু বরফের স্তর এবং অল্পসংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপস্থিতি। এই এলাকা প্রধানত উত্তর মেরু আর্কটিক মহাসাগরে অবস্থিত এবং গ্রিনল্যান্ড,



কানাডা, রাশিয়া ও আলাস্কার উত্তরাঞ্চল দিয়ে বেষ্টিত। অপরদিকে দক্ষিণ মেরু এন্টার্কটিকা মহাদেশে অবস্থিত। উভয় মেরু অঞ্চল গ্রীষ্মকালে লম্বা সময়ব্যাপী দিনের আলো এবং শীতকালে রাতের অন্ধকারে ঢেকে থাকে। প্রতিকূল অবস্থার কারণে মেরু অঞ্চলের সীমিত উদ্ভিদের মাঝে রয়েছে শ্যাওলা, লাইকেন এবং ঝোপঝাড় (Shrubs)। প্রাণীদের মাঝে রয়েছে মেরু ভালুক, পেঙ্গুইন, আর্কটিক শিয়াল, ওয়ালরাস, সীল এবং কয়েক প্রজাতির তিমি। এখানকার ভূমির অধিকাংশই বরফ দিয়ে ঢাকা এবং ভূমিরূপের পরিবর্তন হিমবাহের বরফ দিয়ে পরিচালিত হয়।



অক্ষাংশের প্রভাবে গঠিত ভৌগোলিক অঞ্চল : (উপরে) মেরু অঞ্চল ও তুন্দ্রা অঞ্চল (নিচে) মরুভূমি ও চির হরিৎ বন।

## 11.5.2 তুন্দ্রা অঞ্চল

তুন্দ্রা অঞ্চল হচ্ছে উত্তর গোলার্ধে, বিশেষ করে আর্কটিক এলাকায় অবস্থিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রধানত আলাস্কা, কানাডা, রাশিয়া, গ্রিনল্যান্ড এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কিছু স্থানে এমন অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে উঁচু পর্বতের চূড়ার কাছাকাছিও এ ধরনের এলাকার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। ঠান্ডা তাপমাত্রা, ঠান্ডায় জমে থাকা মাটি এই এলাকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেড়ে ওঠার জন্য সময়টাও বেশ সীমিত তাই এখানে প্রধানত ঠান্ডায় সহনশীল উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। বৃষ্টির স্বল্পতার (প্রধানত তুষারপাত) কারণে এই অঞ্চলকে শীতল মরুভূমি হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও এখানে বেশ কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের গুল্ম, ঘাস এবং শ্যাওলা। প্রাণীদের মাঝে রয়েছে ক্যারিবু, রেইনডিয়ার, কস্তুরী বলদ, আর্কটিক শিয়াল এবং তুষার পেঁচা এবং পিটারমিগান জাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।



### 11.5.3 মরুভূমি

মরুভূমির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতিমাত্রায় শুষ্কতা, এই অঞ্চলে বছরে 250 মিলিমিটারেরও কম বৃষ্টিপাত হয়। এমনও কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে কয়েক বছরের মাঝে কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি। মরুভূমিগুলো প্রধানত উপক্রান্তীয় অঞ্চল অর্থাৎ কর্কটক্রান্তীয় এবং মকরক্রান্তীয় এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। মরুভূমি এলাকায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুষ্ক ও প্রতিকূল জলবায়ু যেখানে দিনে এবং রাতে তাপমাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। পানি এবং গাছপালার অভাবে এই অঞ্চল দিনে অত্যন্ত উষ্ণ এবং রাতে অত্যন্ত শীতল। পানির স্বল্পতার কারণে খুব কম সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণী এখানে বেঁচে থাকতে পারে। উদ্ভিদগুলোর বাইরের আবরণে মোমের মতো আস্তরণ থাকে যা পানি শুষিয়ে যাওয়া রোধ করে এবং এদের লম্বা শিকড় অনেক গভীর থেকে পানি উত্তোলন করতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত প্রতিকূল পরিবেশে বিপাকীয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এসব উদ্ভিদ টিকে থাকতে পারে। ক্যাকটাস, সাকুলেন্ট বা রসালো উদ্ভিদ, ক্রেওসোট বৃশ, জোশুয়া, মরুভূমি আয়রনউড প্রভৃতি মরুভূমির প্রধান উদ্ভিদ। এখানকার প্রাণীগুলো বিশেষভাবে অভিযোজিত হয়ে মরুভূমিতে টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জন করেছে। যেমন—নিশাচর বৈশিষ্ট্য, গর্ত করে থাকার প্রবণতা, শরীরে পানি জমা রাখা এবং অল্প পানি পান করে বেঁচে থাকার সক্ষমতা ইত্যাদি। মরুভূমির প্রধান প্রাণীগুলোর মধ্যে রয়েছে উট, র‍্যাটল স্নেক, স্কিংটিলা, কাঁকড়াবিছা, ফেনেক শিয়াল ইত্যাদি।

### 11.5.4 চিরহরিৎ বন

চিরহরিৎ বন হচ্ছে ঘন বনাঞ্চল যেগুলো সারা বছর—এমনকি শুষ্ক আবহাওয়াতেও সবুজ থাকে। যে সকল এলাকায় তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত তুলনামূলকভাবে বেশি সেসব অঞ্চলে, বিশেষ করে বিষুবীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে এমন বন দেখতে পাওয়া যায়। এই বনাঞ্চলে গাছপালার ঘনত্ব এত বেশি থাকে যে খুব সামান্য সূর্যালোক বনের মাটি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সাধারণত এই বনের উদ্ভিদের পাতাগুলো সবুজ এবং বড়ো আকারের হয় যেগুলো প্রচুর সূর্যালোক শোষণ করতে পারে। এছাড়া এসব উদ্ভিদের মূল মাটি থেকে পানির সঙ্গে প্রচুর পুষ্টিও (neutrient) শোষণ করতে পারে। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে চিরহরিৎ বনে সবচাইতে বেশি ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি বসবাস করে। ইন্দোনেশিয়ার বনাঞ্চল, আফ্রিকার কঙ্গো বনাঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন ইত্যাদি হচ্ছে চিরহরিৎ বন। অনেক সবুজ গাছপালা থাকার কারণে এই বনগুলো বায়ুমণ্ডল থেকে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। বিভিন্ন প্রকার বানর, স্লথ, জাগুয়ার, সাপ, পাখি প্রভৃতি এই বনে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের মাঝে রয়েছে ফার্ন, এপিফাইট, লোহিত সিডার, সাইকাড, নীল স্প্রুস ইত্যাদি।

### 11.5.5 পার্বত্য অঞ্চল

উপরে উল্লেখিত অঞ্চলসমূহের উপর অক্ষাংশের প্রভাব রয়েছে, তবে পার্বত্য অঞ্চল গঠিত হয় মূলত টেকটোনিক প্লেটের ধাক্কার ফলে সৃষ্ট পর্বতের কারণে। পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়

এবং প্রতিকূল। উচ্চতা এবং ঢালের সাথে এখানে মাটি ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। অত্যধিক উচ্চতা এবং খাড়া ঢাল থাকার কারণে এ অঞ্চলে বিভিন্ন ছোট ছোট জলবায়ু (Microclimate) অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায় যা বিভিন্ন ধরনের বিশেষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারণের সহায়ক। এখানকার উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা পাথুরে মাটিতে জন্মাতে পারে, তাপমাত্রার প্রকট তারতম্য সহ্য করতে পারে, এবং উদ্ভিদের দেহে পানি সংরক্ষণ করতে পারে। প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে উঁচু ঢাল হয়ে ওঠা সক্ষমতা ঠান্ডায় গরম থাকার জন্য পুরু পশম, ঠান্ডা মাসগুলোতে শীতনিদ্রায় যাবার প্রবণতা ইত্যাদি।



অক্ষাংশের প্রভাবের পরিবর্তে টেকটোনিক প্লেটের ধাক্কায় গঠিত পার্বত্য অঞ্চল

## 11.6 ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিবেশগত বিষয় ও মানুষের ভূমিকা

বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিবেশগত সমস্যার বিষয়গুলো (issue) বিভিন্ন রকমের হয় এবং সেখানে এসব সমস্যা তৈরি এবং সমাধান উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মেরু অঞ্চল এবং তুন্দ্রা অঞ্চলের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ছে। এসব অঞ্চলে বরফ গলে যাওয়ার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে এবং মেরুভল্লুক, রেইনডিয়ার প্রভৃতি পশুর আবাসস্থল কমে যাচ্ছে। এই সকল অঞ্চলে বন নিধন রোধ করে, টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মরুভূমিতে অতিরিক্ত পশুচারণ এবং তেল উত্তোলনের ফলে মাটি ক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। টেকসই কৃষি ব্যবস্থা এবং সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে এ সকল সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

চিরহরিৎ বনগুলোতে অতিমাত্রায় বন নিধন জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক হুমকি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। বনজ সম্পদ আহরণ কমানো, সংরক্ষণ এবং টেকসই বনব্যবস্থাপনা চর্চার মাধ্যমে মানুষ এই বনগুলো রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পার্বত্য অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন খনি থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, বন নিধন প্রভৃতির কারণে মাটি ক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। বনায়ন কর্মসূচি এবং টেকসই পর্যটন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ

অঞ্চলসমূহ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

মোটকথা, টেকসই উন্নয়ন অনুশীলন এবং সংরক্ষণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যাগুলো মোকাবেলায় সমস্ত অঞ্চলের মানুষের ভূমিকা রয়েছে। আমাদের উচিত পরিবেশের উপর মানুষের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব শনাক্ত করে সেগুলো সমাধানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ করা।